Vol. 59 | No. 1-2 | 2024

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটকের চরিত্র: কতটুকু মানুষ কতটুকু মানুষ নয়

Volume	59
Issue	1-2
Year	2024
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Tariq Manzoor
Published online	December 31, 2024
DOI	10.62328/sp.v59i1-2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v59i1-2.2
Pages	43-54
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ

সাহিত্য পত্রিকা

Journal.bangla.du.ac.bd
Print ISSN: 0558-1583
Online ISSN: 3006-886X
বর্ষ: ৫৯ সংখ্যা: ১-২
ফাল্গুন ১৪৩০॥ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২৪
Issue DOI: 10.62328/sp.v59i1-2

DOI: 10.62328/sp.v59i1-2.2
প্রবন্ধ জমাদান: ২০ জানুয়ারি ২০২৪
প্রবন্ধ গৃহীত: ৫ মে ২০২৪
পৃষ্ঠা: ৪৩-৫৪

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটকের চরিত্র: কতটুকু মানুষ কতটুকু মানুষ নয়

তারিক মনজুর

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইমেইল: t.manzoor707@gmail.com

সারসংক্ষেপ

নাটকের চরিত্র কেবল কাহিনি-প্রবাহে ভূমিকা রাখে না, নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও তত্ত্ব-দর্শন প্রকাশের উপায় হিসেবেও কাজ করে। কখনো কখনো চরিত্র প্রতীকধর্মী হয়ে ওঠে কিংবা বিশেষ ভাবের বাহন হয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটকে কাহিনি শেষতক গৌণ হয়ে থাকে, মুখ্য হয়ে ওঠে চরিত্র। আপাতভাবে ওয়ালীউল্লাহ্‌র চরিত্র বাস্তব জগতের মানুষ; তবে সব ক্ষেত্রে এরা বাস্তব জগতের মানুষের মতো আচরণ করে না। এমনকি, ঘটনা ও সংলাপের সংমিশ্রণে উপলব্ধি করা যায়, এসব চরিত্র বাস্তবতার নিরিখে বিসদৃশ। মানুষ নামধারী এক-একটি চরিত্র কোন বিশেষ উদ্দেশ্যকে বিবেচনায় নিয়ে ওয়ালীউল্লাহ্‌ তৈরি করেছেন, এই প্রবন্ধে তা যাচাই করা হয়েছে।

মূলশব্দ

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌, নাটকের চরিত্র, কাহিনি ও চরিত্রের সম্পর্ক, চরিত্রের প্রতীকধর্মিতা, সংলাপ, বাস্তবতা ও কাহিনি, মুখ্য ও গৌণ চরিত্র।

নাটকের প্রধান চারটি অঙ্গের মধ্যে রয়েছে—কাহিনি, চরিত্র, ঘটনা-সমাবেশ ও সংলাপ। এগুলোর ওপর আশ্রয় করে নাট্যকার তাঁর নিজের বোধ, ভাবনা ও লক্ষ্যকে প্রকাশ করে থাকেন। বিভাস রায়চৌধুরী (১৯৭৪: ২৩) নাটকের অঙ্গগুলোর পারস্পরিকতাকে সম্পর্কিত করেছেন এভাবে: কাহিনি চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করে, চরিত্র কাহিনিকে প্রকাশ করে, উপযুক্ত ঘটনা-সমাবেশে চরিত্র ও কাহিনি মূর্ত হয়ে হঠে এবং সংলাপ চরিত্রকে মুখর করে তোলে।

নাটকে সাধারণভাবে একটি কাহিনি থাকে এবং সেই কাহিনি দাঁড়িয়ে থাকে ঘটনা-সমাবেশের ওপর। আর নাটকের চরিত্র পরিচালিত হয় নাটকীয় ক্রিয়া ও দ্বন্দ্বের অধীনে। কিন্তু নাটকের প্রধান গুণ যে নাটকীয়তা, তা তৈরির পেছনে কাহিনি না চরিত্র কোনটি প্রধান ভূমিকা রাখে, সে সম্পর্কে তর্ক আছে। William Henry Hudson বলেন—

> It is sometimes carelessly assumed that, since the business of the stage is so largely and so necessarily with action, characterization in a play is really of minor importance. ... Characterization is the really fundamental and lasting element in the greatness of any dramatic work. (Hudson 1913: 246)

অর্থাৎ, Hudson-এর মতে, চরিত্রায়ন কৌশলে মহৎ নাট্যসাহিত্য তৈরি হয়। তবে এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য আধুনিক নাটকের জন্য। কারণ, প্রাচীন ধ্রুপদি নাটকগুলো চমৎকারিত্ব লাভ করে কাহিনির মধ্য দিয়ে। সেসব কাহিনি আবার গঠনগত দিক থেকে হয় জটিল, রহস্যময়। রসের দিক থেকে তাতে কয়েকটি রসের উপস্থিতি থাকে এবং যেকোনো একটি রস প্রবলভাবে প্রধান হয়।

আধুনিক নাটকে কাহিনি গৌণ হয়েছে, মুখ্য হয়ে উঠেছে চরিত্র। কারণ, নাটকের নতুন নতুন ফর্ম নিয়ে নাট্যকারদের ভাবতে হয়েছে। নতুন ফর্মের সঙ্গে দর্শকের সংযোগ আগের মতো ধরে রাখার জন্য নাট্যকাররা চরিত্রকে বহুমাত্রিকভাবে ব্যবহার করেছেন। আধুনিক বাংলা নাটকও নানা ধরনের নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে গেছে।[১] আধুনিক নাটকে কাহিনি অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ রয়ে যায়, চরিত্রের গতিবিধি ও কাজ সীমিত হয়ে পড়ে, ঘটনার সঙ্গে সময় ও স্থানের সাধারণ ঐক্য নষ্ট হয়ে যায় এবং সংলাপের পৌনঃপুনিক ও অসমঞ্জস ব্যবহার দেখা যায়।

ইশপের গল্পের এক-একটি পশু এক-একটি মানুষের প্রতিরূপ হয়ে ওঠে—মানুষের আচরণ ও চিন্তার প্রতিফলন ঘটে সেসব চরিত্রের মধ্য দিয়ে। শিশু-কিশোরদের জন্য রচিত নাটক—যেখানে পশু-পাখি থাকে, সেখানেও প্রাণীগুলো প্রকারান্তরে মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে। আবার আধুনিক নাটকের চরিত্রগুলো বাহ্যত মানুষ হয়েও সব ক্ষেত্রে তারা 'মানুষ' থাকে না। রূপক-সাংকেতিক নাটকে তারা কোনো প্রতীক বা ভাবের বাহন হতে পারে। অ্যাবসার্ডধর্মী নাটকে চরিত্রগুলো প্রায়শ উদ্ভট আচরণের মধ্য দিয়ে 'মানুষ'-গুণ হারিয়ে ফেলে। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো নাটকেও বিভিন্ন তত্ত্ব-দর্শন প্রকাশিত হয়; আর সেখানে 'মানুষ'-চরিত্র হয়ে ওঠে তত্ত্ব-দর্শন প্রকাশের মাধ্যম।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র (১৯২২-১৯৭১) নাটক চারটি। এগুলো হলো *বহিপীর* (রচনা ১৯৫৫, প্রকাশ ১৯৬০), *উজানে মৃত্যু* (রচনা ১৯৬৩, প্রকাশ ১৯৭১), *তরঙ্গভঙ্গ* (রচনা ১৯৬৪, প্রকাশ ১৯৬৫) এবং *সুড়ঙ্গ* (রচনা ১৯৫৫, প্রকাশ ১৯৬৪)। এসব নাটকের চরিত্র অনেক ক্ষেত্রে স্থান, কাল ও কাহিনিকে অগ্রাহ্য করে বিশেষ আচরণ করে। এদিক থেকে বলা যায়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ বাংলাদেশের নাটকে নিরীক্ষার সুযোগ নিয়েছেন।[২]

এই আলোচনায় চরিত্রের ক্রিয়া ও সংলাপের পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই করা হয়েছে ওয়ালীউল্লাহ্‌ নাটকের চরিত্রগুলো কতটুকু বাস্তব মানুষ এবং কতটুকু দর্শন, তত্ত্ব বা বক্তব্য প্রকাশের উপায়। আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে এসেছে অন্য সমালোচকদের মত ও মন্তব্য।

১

বহিপীর নাটকে এমন এক পিরের কথা আছে যিনি বইয়ের ভাষায় কথা বলেন। তিনি নাটকের আরেক চরিত্র জমিদার হাতেম আলীকে বলেন, 'আপনি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে আমি কথাবার্তা বিলকুল বহির ভাষাতেই করিয়া থাকি' (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ ১৯৯৬: ৬)। বইয়ের ভাষায় কথা বলার পেছনে কী কারণ রয়েছে, সেটি নাট্যকার পিরের মুখ থেকে উচ্চারণ করেন, 'দেশের নানা স্থানে আমার মুরিদান। একেক স্থানে একেক ঢঙের জবান চালু। এক স্থানের জবান অন্যস্থানে বোধগম্য হয় না ... সে সমস্যা সমাধান করিবার জন্যই আমি বইয়ের ভাষা রপ্ত করিয়া সে ভাষাতে আলাপ আলোচনা কথাবার্তা করিয়া থাকি' (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ ১৯৯৬: ৬)। মুখের ভাষায় প্রমিত রীতির প্রয়োজন কতটুকু, কিংবা আদৌ এর প্রয়োজন আছে কি না, এ সম্পর্কে নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে বহিপীরের এই সংলাপে। এখন যাচাই করা যাক, এই চরিত্রটি কতটুকু বাস্তব-অনুগ হয়েছে।

বহিপীর প্রকাশের আগে *লালসালু* (১৯৪৯) প্রকাশিত হয়। সেখানে মজিদ চরিত্রের মধ্যে সুতীব্র জীবন-পিপাসা লক্ষ করা যায়। মজিদ চরিত্রের মধ্য দিয়ে অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রতিফলন ঘটেছে কি না, এ নিয়ে অবশ্য বিপরীত দুরকম ব্যাখ্যাই[৩] আছে। তবে মজিদ বিষয়ে অধিকাংশ সমালোচকের মত—সে 'ধর্মের বেসাতি'[৪] করে। বহিপীর ধর্মপ্রচারক হয়েও এদিক থেকে মজিদের চেয়ে ব্যতিক্রম। এই নাটকের বহিপীর নিজের স্বার্থের জন্য মজিদের মতো প্রতারণার আশ্রয় নেয় না। একইসঙ্গে উদার মানবীয় গুণসম্পন্ন করে তৈরি করা হয়েছে তাঁকে। তবে বহিপীররের সবচেয়ে বড় পরিচয়, সে আধুনিক চেতনাসম্পন্ন একজন মানুষ।

হাতেম আলীর জমিদারি 'সান্ধ্য আইনে' পড়ে নিলামে ওঠার কথা শুনে বহিপীর প্রথমে খোদার ওপর ভরসা রাখার কথা বলেন—'আহা জমিদার সাহেব, এত বেচইন হইয়া পড়িবেন না, খোদার উপর তোয়াক্কল রাখুন। দুনিয়াটা মস্ত এক পরীক্ষা ক্ষেত্র। খোদা কাকে কীভাবে পরীক্ষা করেন তা বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের নাই (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ ১৯৯৬: ১৫-১৬)। আবার নাটকের শেষে তিনি সমস্যা থেকে বের হওয়ার বাস্তব উপায় নির্দেশ করেন। তাহেরাকে না পেয়েও জমিদারি রক্ষার জন্য বিনা শর্তে তিনি হাতেম আলীকে টাকা দিতে

রাজি হন—'জমিদার সাহেব বিনা শর্তে আপনি টাকা পাইবেন। ইহা দান নয়, ইহা পীরি বদান্যতাও নয়। আপনাকে ইহা লইতেই হইবে।' (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ১৯৯৬: ৩৩)

সাহিত্যে পির চরিত্র—সে পির ভণ্ড হোক আর সাধুই হোক—যেভাবে নির্মিত হয়, ওয়ালীউল্লাহ্ সেভাবে বহিপীরকে নির্মাণ করেননি। এই নাটকে নাট্যকারের বিবেচনা ছিল নতুন যুগের আগমনবার্তা জানান দেওয়া। আর যুগ-বদলের বার্তা দিতেই নাটকের চরিত্রগুলোকে তিনি তৈরি করেছেন। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের দিকে তাকালে এটি স্পষ্ট হয়। যেমন, বহিপীর ধর্মপ্রচারের কাজ রেখে কিছুদিনের জন্য জমিদারি রক্ষার কাজে নেমে পড়তে চান—ভাববাদী জগৎ ছেড়ে তিনি নামতে চান বস্তুবাদী জগতে।

আবার, হাতেম আলী প্রথমে জমিদারি রক্ষার জন্য তাঁর বজরায় আশ্রয় নেওয়া তাহেরাকে পিরের হাতে তুলে দিতে চান। নাটকের শেষে তিনিই আবার জমিদারি হাতছাড়া হয়ে যাবে জেনেও তাহেরাকে পিরের হাতে তুলে দিতে আপত্তি করেন। এই আপত্তি তাঁকে বস্তুগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে, কিন্তু ভাবগতভাবে সমৃদ্ধ করে। জমিদারের মনে এর ফলে যে অনুভূতি তৈরি হয় তা তাঁকে শিহরিত করে—'অনেক তো ভেবেছি এ ক-দিন, ভাবতে-ভাবতে শরীরে আর কিছু নাই। কিন্তু হঠাৎ সব ভয় ভাবনা কেটে গেছে, আরো মনে হচ্ছে, নতুন এক জীবনের স্বাদ পেয়েছি।' (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ১৯৯৬: ৩৩)।

তাহেরাও সাধারণ চারিত্রগুণ অতিক্রম করেছে। যে আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় কাঠামোয় সে বড় হয়েছে, সেখান থেকে বিদ্রোহ করা তার পক্ষে সহজ ছিল না। কিন্তু সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় কোনো রকম ভবিষ্যতের কথা না ভেবেই। ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতীক হয়ে ওঠা তাহেরা বলে—'আমি কি বকরী-ঈদের গরু-ছাগল নাকি?' (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ১৯৯৬: ৪)। নাটকের শেষ দিকে সে আবার জমিদার হাতেম আলীর জমিদারি রক্ষা পাবে ভেবে পিরের কাছে ফিরে যেতে আগ্রহ দেখায়। অর্থাৎ প্রতিটি চরিত্রই তাদের প্রথম অবস্থান ও ধরন থেকে পরিবর্তিত হয়ে ১৮০° বিপরীত আচরণ করতে থাকে।

বহিপীর নাটকের শেষটা লক্ষ করলে নাট্যকারের উদ্দেশ্য ধরা পড়ে। অন্তিমে নাটকীয়ভাবে তাহেরা ও হাশেমকে নতুন জীবনের পানে চলে যেতে দেখা যায়। বহিপীরের মুখ থেকে তখন উচ্চারিত হয়, 'তাহারা তাহাদের নতুন জীবনের পথে যাইতেছে। আমরা কী করিয়া তাহাদের ঠেকাই। আজ না হয় কাল যাইবেই।' (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ১৯৯৬: ৩৫)

স্পষ্টত, বাস্তব জগতের মানুষ হয়েও *বহিপীর* নাটকের এক-একটি চরিত্র বাস্তবের সাধারণ ও স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যকে অগ্রাহ্য করে। বহিপীর নিজের 'বিবি'র ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেন এবং সমষ্টির কল্যাণের চেয়ে ব্যক্তি হাতেম আলীর সংকট দূর করতে অধিক আগ্রহী হয়ে পড়েন। আবার, হাতেম আলী নতুন করে যেভাবে জীবনকে দেখতে শিখেছেন, সাধারণভাবে অন্য কোনো জমিদার সেভাবে জীবনকে দেখবে না; কারণ তাতে জমিদারি হাতছাড়া হয়ে যায়। আবার তাহেরা নিজের ব্যক্তিসত্তার কাছে পুনঃপুন নির্মিত হয়েছে—প্রথমে বয়স্ক পিরের ঘর

করতে চায়নি, পরে হাতেম আলির দিকে তাকিয়ে পিরের কাছে ফিরে যেতে চেয়েছে, পরে তরুণ হাশেমের হাত ধরে অজানার পথে পা বাড়িয়েছে।

তাহেরা-হাশেমের জীবন অনিশ্চিত; কিন্তু নাট্যকার সেই অনিশ্চিত পথের মধ্যেই আধুনিক ইতিবাচক জীবনের অনুসন্ধান করেন।[৫] তাই সাধারণ মানুষ চরিত্র হয়েও *বহিপীর* নাটকের প্রধান চরিত্রগুলো পুরোপুরি বাস্তব জগতের মানুষের মতো আচরণ করে না।

২

উজানে মৃত্যু নাটকে মাত্র তিনটি চরিত্র—নৌকাবাহক, সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ও কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি। নাট্যকারের পরিকল্পনাতে সাদা ও কালো পোশাক পরা যে দুটি চরিত্র দেখা যায়, তারা বাস্তব জগতের সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্কিত নয়। চরিত্র দুটির ক্রিয়া ও সংলাপ স্বাভাবিক জীবনের চলন ও কথোপকথনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এমনকি, নৌকাবাহকও প্রায়শ বাস্তবধর্মকে উপেক্ষা করে কথা বলে।

ক্লাসিক ঘরানার নাটকের মতো এ নাটকে ঘটনার সমাবেশ নেই। জীবনযুদ্ধে বিপর্যস্ত একজন নৌকাবাহক এই নাটকে প্রতিটি ক্ষণ তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করে চলে। সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তির কাছে এই চেষ্টা অর্থহীন, আর কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তির কাছে ঠিক উলটোটা মনে হয়। কালোপোশাকের ব্যক্তি মনে করে, সবকিছুরই অর্থ আছে; কারণ সবকিছুর পেছনেই উদ্দেশ্য বা স্বার্থ থাকে। মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন চরিত্র তিনটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে—

> নাটকের তিনটি চরিত্রই প্রতীক-ধর্মী। জীবন সংগ্রামে ক্লান্ত, সর্বস্বান্ত হয়ে সে [নৌকাবাহক] আজ নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছতে চায় অর্থাৎ মৃত্যু-চেতনা তাকে আচ্ছন্ন করে বসে। সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তি শুদ্ধতার প্রতীক, সে নৌবাবহককে মৃত্যুর পথ থেকে সরে দাঁড়াতে বলে—বিশ্রাম নিতে বলে। কিন্তু কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি চক্রান্তকারী বীভৎসতার প্রতীক, সে নৌকাবাহককে তার ক্লান্তিকর যাত্রা অব্যাহত রাখতে বলে—মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয়। (মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন ১৯৯৫: ৯৫-৯৬)

মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন (১৯৯৫: ৯২) মনে করেন, উজানে মৃত্যু নাটকে 'inner reality ও অভিব্যক্তিবাদী চেতনা'র সার্থক প্রকাশ ঘটেছে। আবার শামীমা হামিদ (২০০১: ১০৬) মনে করেন, এই নাটকে নৌকাবাহকের সংলাপ 'এক ধরনের দার্শনিক সত্যের ইঙ্গিতবহ'। বিশ্বজিৎ ঘোষ লিখেছেন, নাট্যকার এখানে 'অ্যাবসার্ড আবহে চেতন নয়, অবচেতনার জগতে সন্ধানী আলো ফেলেছেন এবং তুলে এনেছেন শুভ্রতা ও কল্যাণের সঙ্গে মলিনতা ও অকল্যাণের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত বিপর্যস্ত মানুষের অন্তর্জগতের স্তরীভূত চিত্র।' (বিশ্বজিৎ ২০২৩: ১৫৪)

গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত এই নাটকের পরপর কয়েকটি সংলাপ বিবেচনায় নিয়ে চরিত্রগুলো কতটুকু 'মানুষ' হয়েছে, তা যাচাই করা যেতে পারে:

নৌকাবাহক॥ (একটু ভেবে, স্মৃতিভরা কণ্ঠে) আমার দুই ছেলে বসন্তে মরেছে। সে তিন বছর হল। তখন সবেমাত্র নতুন বছর এসেছে। মাঠে-মাঠে ঘূর্ণি-হাওয়া।

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি॥ তারপর গত বছর তোমার তৃতীয় ছেলেটিও মরল। আদরের ছেলে, সেও মরল।

নৌকাবাহক॥ (ক্ষণকালের জন্য কেমন স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তারপর তার তার সঙ্গীর কথার পুনরাবৃত্তি করে) সে-ও মরল। বিনা কারণে হাড়মাস হয়ে মরল ছেলেটা।

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি॥ তারপর তোমার বউ। সে-ও আর নাই। ধীরস্থির দয়ালু বউ, সে-ও মরল। কিন্তু তুমি ছাড়া আর কেউ কি বউ হারায় নাই?

নৌকাবাহক॥ (হঠাৎ সন্দিগ্ধভাবে) আমার বউ-ছেলেদের কথা বলছ কেন?

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি॥ সারারাত অর্থহীনভাবে খালি নৌকা টেনেছ, তুমি জান না কেন? শোন! তোমার বুকে অনেক দুঃখ, কিন্তু তাই বলে এমন পাগলামি করবে নাকি? (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ১৯৯৬: ৪১-৪২)

চরিত্রের নাম বাদ দিয়ে শুধু সংলাপের দিকে লক্ষ করলে বোঝা যায়, একজন ব্যক্তি তার দুঃখের কথা বলতে বলতে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, আর অন্য জন তার সহমর্মী বন্ধু হয়ে কথা বলছে। এখানে যে ধরনের কথোপকথন চলেছে, তাতে এদেরকে বাস্তব জগতের মানুষের প্রতিনিধি বলতে দ্বিধা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু প্রায়শ উজানে মৃত্যু নাটকের চরিত্রগুলো অসঙ্গত ও পারম্পর্যহীন সংলাপ বলে চলে। একজনের কথার পরিপ্রেক্ষিতে অন্য জন নিজের মতোই সংলাপ বলে যায়, যে সংলাপের সঙ্গে পূর্ব বা পরবর্তী সংলাপের কোনো সম্পর্ক থাকে না। আবার, চরিত্র তিনটির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে তাদেরকে তিনটি মানুষ বলা যায় না, বড় জোর বলা যায়—তিনটি সত্তা। এখানে নৌকাবাহক মানুষের চেতনা-সত্তা; আর সাদা ও কালো রঙের পোশাক পরা ব্যক্তিদুটি মানুষের চেতনার দুই বিপরীতমুখী দ্বিধা-সত্তা।

৩

তরঙ্গভঙ্গ নাটকে ঘটনা-সমাবেশ নেই, তবে একটি কাহিনি আছে। সেই কাহিনিটি দীর্ঘ নয়। আমেনা নামের একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের মেয়ে তার কোলের শিশু-সন্তানকে হত্যা করেছে। এই হত্যার পেছনে দায়ী সে যতটুকু, তার চেয়ে বেশি দায় গড়ে ওঠা সমাজের ব্যবস্থার ও অব্যবস্থার। আমেনার বিচারকাজ দিয়ে নাটকটির শুরু; আর নাটকটি শেষ হয় জজের ফাঁসির রায় ঘোষণার সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে।

বিস্ময়কর হলো, এই নাটকের মূল যে চরিত্র, সেই আমেনা পুরো নাটকেই উপস্থিত, কিন্তু সে কোনো সংলাপ উচ্চারণ করে না। এর মানে এই নয় সে বোবা। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কোনো কথা না বলেও সে প্রায় নিশ্চিত কঠিন পরিণতির সম্ভাবনার সামনে পড়ে। বাস্তবের বিচারালয়ে এভাবে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কোনো ব্যক্তি অবলীলায় চুপ থাকতে পারে না। তাছাড়া

আমেনার নির্লিপ্ততা দর্শক-পাঠককে বিস্মিত করে; কারণ তার আরো তিনটি সন্তান আছে। তবে শিশু-হত্যার পরেও দর্শক-পাঠকের ক্ষোভ আমেনার ওপর গিয়ে পড়ে না।

অভিযোগকারী মৌলবী আবদুস সাত্তার বলেন, 'জঙ্গলের মধ্যে মরা-বাচ্চা কোলে নিয়ে সে যখন বসে ছিল তখন তার বুকে কাপড় ছিল না। বে-শরমের মতো খোলা-বুকে বসে ছিল।' এই সংলাপের বিপরীতে ভিখারিনী হেসে উঠে বলে, 'গলা টিপে মারার আগে শিশুকে শেষবার দুধ দিতে চেয়েছিল। কিন্তু শুষ্ক স্তন থেকে এক ফোঁটা দুধ আসে নাই।' (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ ১৯৯৬: ৮৬)

নাট্যকার বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে *তরঙ্গভঙ্গ*র চরিত্রগুলো নির্মাণ করেছেন। যেমন, আমেনা চরিত্রটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কোনো অচেনা মানুষ নয়, চেনা মানুষ। কিন্তু এই 'চেনা' পরিচয় দিয়ে নাটকের আমেনাকে পুরোপুরি চেনানো যায় না। আদালতে আসার আগ পর্যন্ত সে একজন মানুষ হয়েই ছিল; পরে সে হয়ে ওঠে বহু মানুষের প্রতিনিধি। জীবন-বাস্তবতার আঘাতে মানুষ নির্বাক হয়; শত শত দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের প্রতিনিধি আমেনাও তাই নির্বাক হয়ে থেকেছে নাটকে। এই বাক্‌হীনতা একইসঙ্গে মানুষের অসহায়ত্ব প্রকাশ করে।

তরঙ্গভঙ্গ নাটকের স্থান—বিচারালয়। এই বিচারালয়ে ভিখারিনী যেভাবে কথা বলেছে, তা বাস্তবের বিচারালয়ে অসম্ভব। বাস্তব-অসম্মত এই চরিত্রটি কি তাহলে মানুষ নয়? নাট্যকার নিজেই ভিখারিনীর সংলাপে একসময় বলে দিয়েছেন, সে মানুষ নয়। দ্বিতীয় দৃশ্যের অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ভিখারিনী আহত মানুষর মতো শরীর টেনে এগোতে এগোতে আবদুস সাত্তারকে বলে, 'দেখতে পাচ্ছেন না সর্বনাশীর আগমন? আমি মানুষ নই। দেখতে পাচ্ছেন না বিষধর সাপের মতো বুকে হেঁটে আসছি? মানুষ কি এভাবে চলে? আপনার সামনে মানুষ সাপ বনেছে।' (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ ১৯৯৬: ১১৬)

এমনকি বিচারালয়ের জজ সাহেবের আচরণও অস্বাভাবিক এবং বাস্তবের সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক। নাটকের পর্দা উঠলে দেখা যায়, বিচারক নিজের আসনে নিদ্রাচ্ছন্ন। আবার দ্বিতীয় দৃশ্যের পর্দা নামার আগে তাকে আদালত-প্রাঙ্গণে ফাঁস নিয়ে ঝুলতে দেখা যায়। তবে নাটকের শেষ দৃশ্যে তিনি বাস্তব জজের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

বাস্তবের বিচারালয়ে মৌলবী আবদুস সাত্তারের ভূমিকাও পালটে যায়—আগের দুটি দৃশ্যে তিনি আমেনার বিচারের জন্য সোচ্চার, আর শেষ দৃশ্যে তিনি আমেনার ফাঁসির আদেশ মওকুফ করার জন্য তদবির করেন। এসব দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, এমন মৌলবিই ওয়ালীউল্লাহ্‌র কাম্য—যিনি ধর্মকে ব্যবহার করবেন মানুষের কল্যাণে। প্রকৃতপক্ষে ওয়ালীউল্লাহ্‌ ধর্মকে জীবনের ইতিবাচক উপাদান হিসেবে দেখেছেন, আর ধর্মান্ধতাকে জীবনের নেতিবাচক উপাদান মনে করেছেন। *লালসালু* উপন্যাসের মজিদ আর *চাঁদের অমাবস্যা* (১৯৬৪) উপন্যাসের কাদের বাহ্যত ধর্মের লেবাসধারী, তাদের হৃদয়ে ধর্মের লেশমাত্র নেই। তাই

লেখকের যথেষ্ট করুণা তৈরি হয় না তাদের প্রতি, এমনকি তাদের দিকে পাঠকের ঘৃণাও খানিক ছুটে যায়।

আবদুল মান্নান সৈয়দ *তরঙ্গভঙ্গ* নাটকের বাস্তব-অবাস্তব দৃশ্যায়ন এবং চরিত্রগুলোর একের অধিক ভূমিকা ও বৈশিষ্ট্যকে মূল্যায়ন করেছেন এভাবে—

> বিচারসভা স্বপ্ন বা কল্পনার রূপ নেয় এক বিশাল অবচেতন রঙ্গমঞ্চে—যেখানে মানুষের বিবেক, পাপবোধ, অপরাধবোধ রূপ ধরে অনুষ্ঠিত হয়। বিচারণ সেখানে পরিণত হয় বিদূষকে, ভিখারিনী দার্শনিকে, অকৃতকার্য এক তুচ্ছ কন্ট্রাক্টর বিবেকে, ধার্মিক নেওলাপুরী রহস্যময় হত্যার সহযোগীতে। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত আবার সবাই পরিণত হয় স্বাভাবিক প্রচল ও গতানুগতিতে। (আবদুল মান্নান ২০০১: ৮৯)

শ্রেণিবিন্যস্ত সমাজে এক পক্ষ প্রতিনিয়ত অপর পক্ষের প্রতি চাপ তৈরি করে। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর মনে করেন, *তরঙ্গভঙ্গ* নাটকে ন্যায় এবং অন্যায়ের দ্বন্দ্ব দেখনো হয়েছে (২০২৩: ১৭০)। তিনি সিদ্ধান্তে এসেছেন এভাবে—

> সৈয়দ এই বিরোধ, সংঘাত এবং বৈপরীত্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝেছেন। সেজন্য তাঁর অধিকাংশ চরিত্র তৈরি হয় পীর, মওলানা থেকে; অধিকাংশ চরিত্রের পটভূমিতে কাজ করে ভণ্ডামি এবং তঞ্চকী; অধিকাংশ চরিত্র আবার নামহীন: যুবক, ভিখারিনী, শ্রোতা, গ্রামবাসী, জজ; নামহীন চরিত্ররা একটি সমাজ স্তরের প্রতিভূ; একটি চিন্তার প্রতীক। (বোরহানউদ্দিন ২০২৩: ১৭১)

তরঙ্গভঙ্গ নাটক রচনার কাছাকাছি সময়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ *চাঁদের অমাবস্যা* উপন্যাস রচনা করেন। এ দুটি নাটক-উপন্যাসেই মৃত্যু আছে; মৃত্যুকে ঘিরেই কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। দুটি রচনাতেই কাহিনি গৌণ—ঘটনা-সমাবেশ হয়নি বললেই চলে। দুই জায়গাতেই অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রতিফলন ঘটেছে—কন্ট্রাক্টর মতলুব আলী আর শিক্ষক আরেফ আলীর মাধ্যমে। এরা দুজনই হত্যা না করেও নিজেরা পাপবোধে ভোগে।

তরঙ্গভঙ্গ নাটকে একেকটি চরিত্র এক-একটি শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে। তাছাড়া এই নাটকে তত্ত্বেরও প্রকাশ ঘটেছে চরিত্রের ক্রিয়া ও সংলাপের মধ্য দিয়ে। ওয়ালীউল্লাহ্ ইউরোপীয় নাট্যধারা সম্পর্কে অবগত[৬] ছিলেন বলেই চরিত্রকে তত্ত্ব প্রকাশের উপায় করতে পেরেছেন।

৪

সুড়ঙ্গ নাটকের শেষাংশে শাবল-বন্দুক নিয়ে ছোটাছুটি, রেজ্জাক সাহেবের ব্যতিব্যস্ততা, ডাক্তারের বালসুলভ সংলাপ, কলিমুদ্দিনের তড়িৎ পলায়নপর অবস্থা, রাবেয়ার হাস্যকৌতুক—সব মিলিয়ে চূড়ান্ত কমেডির বিস্ফোরণ ঘটেছে। নাটকটির হাস্যরসাত্মক বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করেও মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন একে 'রূপক নাটক' বলেছেন—

> এর সাধারণ বা বাহ্যিক বক্তব্য: দু'জন যুবক বা বয়ঃসন্ধিকালের বালকের গুপ্তধন উদ্ধারের প্রচেষ্টা—যা কিশোর ও বালকসুলভ মানসিকতার প্রকাশ, এবং যার পেছনে উদ্দেশ্য রয়েছে

> হাস্যরস সৃষ্টি। আর নাটকটির অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে: দু'জন যুবক মনে মনে রাবেয়াকে কামনা করে, ভালোবাসা পেতে চায়, কিন্তু রাবেয়ার অন্যত্র বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। ফলে তারা দু'জনেই উপস্থিত হয়েছে সশরীরে। (মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন ১৯৯৫: ৮৩)

অবশ্য জীনাত ইমতিয়াজ আলী মনে করেন, জাত বিচারে এটি রূপক নাটকের মর্যাদা হারিয়েছে। তবে তিনি ওয়ালীউল্লাহ্‌কে অ্যাবসার্ডবাদী নাট্যকার হিসেবে মনে করেন এবং যুক্তি দেখান: অ্যাবসার্ডবাদী নাট্যকারদের সৃষ্টিতে চরিত্র দুটি বিশিষ্ট চারিত্রে রূপ লাভ করে—মঞ্চে তাকে যতটুকু দেখা যায় তার বাইরে মঞ্চের আড়ালে সেই পরিমাণেই সে উপস্থিত থাকে। নাটকে সুড়ঙ্গ করার লক্ষ্য গুপ্তধন হলেও সেই আবহ তৈরি হয়েছে যুবকের মাধ্যমেই। কিন্তু নাট্যকার তাকে রেখেছেন দৃশ্যের অন্তরালে, পর্দার নেপথ্যে। (জীনাত ২০০১: ১৮১)

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০২৩: ১৪৭) *সুড়ঙ্গ* নাটকে অ্যাবসার্ডধর্ম খুঁজে পান এবং বলেন, 'নাটকটির কাহিনি রহস্যমণ্ডিত, জটিল, অবিশ্বাস্য এবং এই রহস্য ও অবিশ্বাসের পটে ওয়ালীউল্লাহ্‌ তুলে আনতে চেয়েছেন মানুষের চেতনার গভীরস্থ লোভ-লালসা-ঘৃণা এবং ঈর্ষাকে।

ওপরের তিনটি মতকে বিবেচনায় নিয়ে বলা যায়, *সুড়ঙ্গ* নাটকের চরিত্রগুলো সাধারণভাবে মানুষ, কিন্তু বিশেষ বিবেচনায় তারা এক-একজন বিশেষ বিশেষ ভাবপ্রকাশের দ্যোতক। তবে, এই নাটকে প্রতীক, রূপক ও তত্ত্ব আরোপ করলে নাটকটির আসল আমোদ নষ্ট হয়ে যায়; কারণ নাট্যকার ভূমিকায় বলেছেন, 'নাটকটি প্রধানত কিশোর-কিশোরীদের জন্যে লেখা। তবে তরুণমনা বয়স্করা—যারা সম্ভব-অসম্ভব নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না, তারা এটি পড়ে বা দেখে আমোদ বোধ করবেন বলে আশা রাখি।' (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ ১৯৯৬: ৫৫)

৫

কবীর চৌধুরী একটি গ্রন্থে[৭] ইউরোপের কয়েক জন নাট্যকারের পরিচিতি তুলে ধরেছেন। অগাস্ট স্ট্রিন্ডবার্গ (১৮৪৯-১৯১২) সম্পর্কে বলেছেন, তাঁর নাট্যকর্ম 'জীবন ঘনিষ্ঠ মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতায় ঋদ্ধ' (কবীর ১৯৮৫: ১৪); গেরহার্ড হাউপ্টমান (১৮৬২-১৯৪৬) সম্পর্কে বলেছেন, 'তাঁর জীবন ও সাহিত্যকর্মের মৌল উৎস ছিলো সাধারণ মানুষের জন্য সুগভীর মমত্ববোধ' (কবীর ১৯৮৫: ২১); মরিস মেটারলিঙ্ক (১৮৬২-১৯৪৯) সম্পর্কে বলেছেন, তাঁর সাহিত্যকর্মে 'প্রায়ই মৃত্যু ও নিয়তির অমোঘ রহস্যময় উপস্থিতি লক্ষণীয়' (কবীর ১৯৮৫: ৪২)। তিন জন নাট্যকারকে নিয়ে করা তিনটি মন্তব্যই ওয়ালীউল্লাহ্‌ সঙ্গে মিলে যায়। ওয়ালীউল্লাহ্‌ও জীবনঘনিষ্ঠ নাটক লিখেছেন, নাটকে সাধারণ মানুষের জন্য তাঁর গভীর মমত্ববোধের প্রতিফলন ঘটেছে এবং প্রায়ই তাঁর নাটকে মৃত্যু আর নিয়তির অমোঘ রহস্যময় উপস্থিতি ঘটেছে।

তবে এত কিছুর পরেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ পরিবর্তন দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা শুধু নাটকের ফর্মে নয়, জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রেও। বার্টোল্ড ব্রেখটের (১৮৯৮-১৯৫৬) মতো তিনিও মনে করতেন পৃথিবীকে পরিবর্তন করা সম্ভব (কবীর ১৯৮৫:

৯১); তাই স্পষ্ট ইতিবাচকতার মধ্য দিয়ে তাঁর নাটক শেষ হয়। যুক্তি দিয়ে সেই ইতিবাচকতাকে বিচার করতে হয়।

Ernst Fischer যথার্থই বলেছেন, বিচ্ছিন্ন পৃথিবীর সমাজবাস্তবতা প্রতিফলিত হয় বিষয় ও চরিত্রের বিচ্ছিন্নতার মধ্য দিয়ে, আর তা বুঝতে হবে যুক্তির নিরিখে—

> In the alienated world in which we live, social reality must be presented in an arresting way, in a new light, through the 'alienation' of the subject and the characters. The work of art must grip the audience not through passive identification but through an appeal to reason which demands action a decision. (Fischer 1971: 10)

তবে বাস্তবতার প্রতিফলন নাটকে সরাসরি ঘটে না। বিভাস রায়চৌধুরী বলেন, 'নাটক ঠিক জীবনের অনুকরণ নয় বা প্রতিচিত্রও নয়। নাটক যদি কেবলমাত্র জীবনের অনুকৃতি ও প্রতিচিত্রণ হইত, তাহা হইলে আনন্দের জন্য অথবা রসোপলব্ধির জন্য আমরা ঠিক নাটক দেখিতাম না। (বিভাস ১৯৭৪: ১৬)

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কাহিনির পটভূমি তৈরির জন্য বাস্তব জীবনকে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু বক্তব্য প্রকাশের জন্য চরিত্রকে নির্মাণ করেছেন স্বাধীনভাবে। *বহিপীর, উজানে মৃত্যু, তরঙ্গভঙ্গ, সুড়ঙ্গ*—চারটি নাটকেরই কাহিনি দাঁড়িয়ে আছে বাস্তব প্রেক্ষাপটের ভিত্তিভূমিতে। তবে সেই ভিত্তি দুর্বল করে দিয়েছে চরিত্রগুলোর বাস্তব-অতিক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং স্বাভাবিকতা-বিবর্জিত সংলাপ। এসব চরিত্র নাট্যকারের উদ্দেশ্য পূরণের প্রধান সহায় হয়ে কাজ করেছে।

বহিপীর নাটকের চরিত্রগুলো যতটুকু মানুষ, তার চেয়ে বেশি—অনাগত নতুন সময়ের পথিকৃৎ। *উজানে মৃত্যু* নাটকের চরিত্রগুলো মানুষের কাঠামোয় দাঁড়িয়ে থাকা অবচেতন মন এবং সেই মনের দুই বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়া। *তরঙ্গভঙ্গ* নাটকের এক-একটি চরিত্র সমাজের একক কোনো মানুষ নয়, বরং এক-একটি শ্রেণির প্রতিনিধি। *সুড়ঙ্গ* নাটকের চরিত্রগুলো রূপক অর্থ প্রকাশের বাহন হয়ে সম্ভব-অসম্ভব আচরণ করেছে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র চারটি নাটকেই চরিত্রসংখ্যা সীমিত। যখন সাধারণভাবে পাঠ করা হয়, তখন নাটক চারটির চরিত্রগুলো স্বাভাবিক মানুষ বলে মনে হয়। তবে যুক্তির নিরিখে কাহিনি, ঘটনা আর সংলাপের সঙ্গে চরিত্রকে মিলিয়ে পড়লে দেখা যায়, এসব চরিত্রের অধিকাংশই তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে ছাপিয়ে 'ব্যঞ্জনা'[৮] ধারণ করে।

ওয়ালীউল্লাহ্ ইউরোপের আধুনিক নাটক সম্পর্কে অবগত ছিলেন। বাংলাদেশের সমাজ ও সমাজবাস্তবতাকে কাহিনির পেছনের প্রেক্ষাপট হিসেবে ব্যবহার করে তিনি বাংলা নাটকে ইউরোপীয় আধুনিক ফর্মের প্রয়োগ করেছেন। আধুনিক ফর্মের এই প্রয়োগ চরিত্রগুলোকে পুরোপুরি 'মানুষ' থাকতে দেয়নি।

টীকা

১. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান (১৯৬৪: ৪৮০) উল্লেখ করেছেন, আঙ্গিকের পরীক্ষার জন্য যে কয়টি নাটক বাংলাদেশে লেখা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে আছে ফররুখ আহমদের *নৌফেল ও হাতেম,* মুনীর চৌধুরীর *কবর* ও *দণ্ডকারণ্য,* সিকান্দার আবু জাফরের *শকুন্ত উপাখ্যান* ও *মাকড়সা,* সাঈদ আহমদের *কালবেলা,* সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ *উজানে মৃত্যু,* এবং সৈয়দ আলী আহসানের *কোরবাণী, জোহরা ও মুশতারী* ও *জুলায়খা*। তাঁরা মনে করেন, এসব নাটক পরীক্ষা করলে একটি কথা স্পষ্ট হয়, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের নাট্যরীতির সঙ্গে আমাদের শিল্পীদের অন্তরঙ্গ পরিচেয়ে ঘটেছে এবং তারা অনবরত নতুন সম্ভারে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করছেন।

২. সৈয়দ আবুল মকসুদ (১৯৮১: ১৬৬) বলেন, 'কিছু নিরীক্ষার প্রশ্ন যদি ওঠে, সে কাজটি প্রথম করেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌।'

৩. সৌদা আখতার (২০০১: ১৪) বলেছেন, ওয়ালীউল্লাহ্‌ উপন্যাসে অস্তিত্ববাদের গভীর ও প্রগাঢ় কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। আবার জীনাত ইমতিয়াজ আলী (২০০১: ১১৫) লিখেছেন, মজিদের অস্তিত্ববোধের বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য ঔপন্যাসিক অনুষঙ্গবাহী শব্দও ব্যবহার করেছেন।

৪. 'এ উপন্যাসে প্রকৃত ধর্মের জায়গায় ধর্ম-ব্যবসার স্বরূপ সূক্ষ্মভাবে উদঘাটিত করে তিনি দেখিয়েছেন যে, বিবেক ও মানবিকতা-বর্জিত ধর্মের বেসাতি মানুষের জীবনকে কতখানি অর্থহীন ও অন্তঃসারশূন্য করে তোলে। (শিরীণ ১৯৯৩: ১৭১)

৫. নুরউল করিম খসরু লিখেছেন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ আধুনিক মননের অধিকারী ছিলেন এবং স্ব-সমাজের মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে তিনি সাহিত্যচর্চা করে গেছেন (২০০২: ১০০)। ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রতিটি নাটকের শেষে এই দায়িত্ববোধের স্পষ্ট পরিচয় আছে—নাটকগুলোর পরিসমাপ্তি ঘটেছে ইতিবাচকতায়।

৬. ১৯৭১ সালের জানুয়ারিতে *উজানে মৃত্যু* সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ এক সাক্ষাৎকারে মমতাজউদদীন আহমদকে জানান, '*তরঙ্গভঙ্গ*-এর জের টেনে আর কী হবে। *উজানে মৃত্যু* নাটকটির ইতালীয় এবং ফরাসী রূপ সে সব দেশের মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। কিন্তু দেশে ফিরে জানলুম এ নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়া দূরে থাক অনেকেই পড়েও দ্যাখেননি। আর পড়লেও মনোযোগ দিয়ে অনুধাবন করতে চাননি। আমার ইচ্ছা ছিল—ওই ফর্মে আরো আটটি নাটিকা লিখে পাঠাবো।' (উদ্ধৃত, মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন ১৯৯৫: ৯১)

৭. *ইউরোপের দশ নাট্যকার* (১৯৮৫)

৮. 'ব্যঞ্জনা' বলতে এখানে সাধারণ অর্থের বাইরে গূঢ় অর্থের প্রকাশকে বোঝানো হচ্ছে। এই 'ব্যঞ্জনা' অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকেও ধারণ করে। মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন (১৯৯৫: ১০০) অবশ্য ওয়ালীউল্লাহ্‌ সম্পর্কে বলেছেন, 'প্রতীক চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি নাটকের মূল বক্তব্য উপস্থাপনে সচেষ্ট হয়েছেন।'

সহায়কপঞ্জি

আবদুল মান্নান সৈয়দ (২০০১)। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌*। ঢাকা: অবসর।

কবীর চৌধুরী (১৯৮৫)। *ইউরোপের দশ নাট্যকার*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

জীনাত ইমতিয়াজ আলী (২০০১)। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্: জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম*। ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী।

নুরউল করিম খসরু (২০০২)। *আধুনিকতা ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্*। ঢাকা: ঐতিহ্য।

বিভাস রায়চৌধুরী (১৯৭৪)। *নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা*। কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০২৩)। 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ নাটক নিয়ে', *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্: জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ ২০২২* (তাশরিক-ই-হাবিব সম্পাদিত)। ঢাকা: পরানকথা।

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (২০২৩)। 'নাটকে তাঁর লড়াই', *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্: জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ ২০২২* (তাশরিক-ই-হাবিব সম্পাদিত)। ঢাকা: পরানকথা।

মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান (১৯৬৪)। *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (আধুনিক যুগ)। চট্টগ্রাম: বইঘর।

মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন (১৯৯৫)। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র নাটক*। ঢাকা: মুক্তধারা।

শামীমা হামিদ (২০০১)। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সাহিত্যকর্ম, শব্দব্যবহার ও চেতনাপ্রবাহরীতি*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

শিরীণ আখতার (১৯৯৩)। *বাংলাদেশের তিন জন ঔপন্যাসিক*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

সৈয়দ আবুল মকসুদ (১৯৮১)। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ জীবন ও সাহিত্য*। ঢাকা: মিনার্ভা বুক্স।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯৯৬)। *নাটকসমগ্র* (হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত)। ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা।

সৌদা আখতার (২০০১)। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ লালসালু ও অন্যান্য প্রবন্ধ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

Hudson, William Henry (1913). 'The Study of the Drama', *An Introduction to the Study of Literature*. London: George G. Harrap & Company.

Fischer, Ernst (1971). 'The Function of Art', *The Necessity of Art: A Marxist Approach* (Translated by Anna Bostock). London: Penguin Books.